ভূমিকা

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি প্রধান উপাদান হল অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। ক্ষুধার অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, আর মাথা গোঁজার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়, এই তিনটি জিনিস থাকলেই মানুষ জীবনধারণ করতে পারে। কিন্তু এই তিনটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদানেরও ঘাটতি দেখা দিলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। বিঘ্নিত হয় সভ্যতার ক্রমপ্রবাহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী সময়কালে এই তিনটি জিনিসেরই অভাব দেখা দিয়েছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর যখন আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণভেরী বেজে উঠল তখন পরাধীন ভারত দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে জর্জরিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর কেড়ে নেয় লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস। গ্রামের মানুষ খেতে না পেয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় কালোবাজারি ও চোরাকারবারির জন্য খাদ্য সঙ্কটের পাশাপাশি দেখা দেয় বস্ত্র সংকট। লজ্জা নিবারণের জন্য ছেঁড়া তেনি, গাছের পাতা, চটের বস্তা হয় একমাত্র অবলম্বন। মেয়েরা নিজেদের সম্মান বাঁচাতে দিনের বেলা বাড়ি থেকে বের হতো না। অন্যদিকে খাবারের খোঁজে সন্তান সন্ততি পরিবার নিয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরনোর জন্য সাধারণ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে হল ফুটপাতের বাসিন্দা। বুভুক্ষু মানুষের দল মহানগরের পথে পথে ভিক্ষার পাত্র হাতে ঘুরতে থাকে দুমুঠো খাবারের আশায় কিন্তু খাবার তো অনেক দূরের কথা, একটু ভাতের ফ্যানের জন্য হাহাকার করতে করতে কঙ্কালসার বুভুক্ষু মানুষের দল আর্তনাদ করে পথে ঘাটে মারা গেল পঞ্চাশের মন্বন্তরে। অন্যদিকে দেশভাগ চোখের পলকে বদলে দিল কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে তারা পাড়ি দিল এক অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে। বাস্তুহারা মানুষের যন্ত্রণায় মুখরিত হল বাংলার আনাচ-কানাচ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলল। ঘরের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করার জন্য প্রাণের ভয়ে যে যেখানে পারল পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল কিন্তু এই রকম টালমাটাল অবস্থায় কোনও জায়গাই

সুরক্ষিত ছিল না সাধারণ মানুষের জন্য। নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পাড়ি দিল ভারতের উদ্দেশ্যে। ভারতে আসার পর তাদের যে দুর্গতি হল তার কোনও তুলনা নেই। আপামর ভারতবাসী স্বাধীনতার যে স্বপ্ন লালন করছিল বুকের মাঝে সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে। স্বাধীন দেশে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে যারা ঘর ছেড়েছিল তাদের প্রথম ঠিকানা হল শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম। প্লাটফর্ম থেকে রিফিউজি ক্যাম্প। সে আর এক নারকীয় জীবন। একটা পুরো জাতি এই সময় একটি নিরাপদ সুরক্ষিত আশ্রয়ের জন্য মাথা খুঁড়ে মরেছে কিন্তু তাদের যোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের সরকার করতে পারেনি। ঘর হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে তারা লড়াই করেছে প্রতিনিয়ত। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। কখনও তারা দণ্ডকারণ্যের পাথুরে জমিকে কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত করেছে পুনর্বাসনের জন্য, আবার কখনও পাড়ি দিয়েছে সুদূর আন্দামানে। প্রতিনিয়ত এই ছিন্নমূল মানুষগুলি এদেশের মাটিতে তাদের শিকড় বিস্তার করতে চেয়েছে কিন্তু বারবার তাদের উপড়ে ফেলে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। তবুও এই ছিন্নমূল মানুষগুলি অনিশ্চয়তার জীবন থেকে একটি নিশ্চিত সুরক্ষিত জীবনে পরিবার পরিজনদের নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে লড়াই করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভাঙন নিয়ে আসে। সেই ভাঙনে মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের সব শালীনতা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল, যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরল, মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেল।

আর সেই ভাঙনের ছবি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ধরা দিল এক ভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলা নাটকেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা নাটকেও প্রতিফলিত হল সেই ভাঙনের ছবি। যুগ পরিবর্তনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে লক্ষ লক্ষ বাঙালির লড়াই, তাদের ত্যাগ কুর্নিশের দাবি রাখে। অথচ ইতিহাস এবং সাহিত্য লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা দেখেও মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল কোনও এক

অজানা কারণে। সাহিত্যে খুবই কম উঠে এসেছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর জীবনের অশেষ দুর্গতির কথা। ঘর হারানোর বেদনায় কাতর মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের কথা খুব কম কয়েকজন সাহিত্যিক নিজের রচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন। মাথার উপর থেকে যখন ছাদ চলে যায়, ভয়ে, আতঙ্কে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় তখন সেই ঘরের তুলসী তলা, উঠোন, বারান্দা জড়িয়ে ধরে মানুষের মনকে। কিছুতেই সে যেন মায়ার বাঁধন কাটিয়ে যেতে দেবে না। জন্মভূমির সাথে মানুষের আত্মিক যোগাযোগ। যেখানে মানুষ জন্মেছে, বড় হয়েছে সেখানকার স্মৃতি তার রক্তে মিশে যায়। কোনও কারণে জন্মভূমি থেকে দূরে গেলে সেই স্মৃতিই তাকে আবার টেনে আনে জন্মভূমির কাছে কিন্তু কোনও এক রাজনৈতিক কারণে যখন জন্মভূমিতে আর কোনোদিন ফেরা হবে না, তখন সেই গৃহত্যাগ হয়ে ওঠে আরও বেশি যন্ত্রণাময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী সময় পর্বে বিভিন্ন কারণে যে বাসস্থানের সংকট দেখা দিয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা হয়নি অথচ এই বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। তাই এই অনালোচিত বিষয়টি আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। " দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা নাটকে বাস্থানের সংকট ও সমাধান : একটি পর্যালোচনা (১৯৪০-১৯৮০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাসস্থানের সংকট ও সমাধান আলোচনার সুবিধার্থে অভিসন্দর্ভটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে আগমন থেকে ভারতের শাসনকর্তা হয়ে ওঠা এবং দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে জর্জরিত ভারতের আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাসের সূত্র ধরে ইংরেজদের ভারতীয়দের উপর যে শাসন এবং শোষণ চলেছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ এবং বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে সাধারণ মানুষের সংকটের কথা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মানুষ আজও প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল। কখনও সে দুহাত ভরে দেয় আবার কখনও অসীম রোষে কেড়ে নেয় শেষ সম্বলটুকু। আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। এই নদীমাতৃক দেশে প্রায়শই দেখা যায় বন্যা। এছাড়াও সুনামি, সাইক্লোন, ভূমিকম্প বিভিন্ন সময় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় কৃষিকাজ যেমন ভালো হয়, তেমনি অতিবৃষ্টিতে, বন্যায় ভেসে যায় ঘরবাড়ি, মাঠ ভরা ফসল, আবার কোনও সময় অনাবৃষ্টিতে দেখা যায় খরা। তখন কোনও চাষবাস হয় না। প্রকৃতি যেমন মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন জোগায়, তেমনি কখনও কখনও সেই ক্ষুধার অন্ন কেড়েও নেয় অসীম রোষে। যার ফলস্বরূপ দেখা যায় দুর্ভিক্ষ, আকাল। কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যায় মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধ্বংস করে ব্যক্তি বিশেষকে নয় সমষ্টিকে, যার ফলে ধ্বংস হয় সভ্যতা। ইতিহাসের পাতায় যে আদি সভ্যতাগুলির কথা আমরা পড়ি সেগুলি আজ কালের গহ্বরে তলিয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে বাংলার বুকে আছড়ে পড়েছিল সাইক্লোন। যার ফলে বেশ কয়েকটি জেলা বন্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও বিশ্বযুদ্ধে সরকারের সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য মজুত করা, পোড়ামাটি নীতির ফলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। কালোবাজারিদের কুচক্রে এবং সরকারের উদাসীনতায় সেই খাদ্যাভাব মন্বন্তরের রূপ ধারণ করে। কয়েক লক্ষ লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শহরের উদ্দেশ্যে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে মানুষকে ঘরছাড়া করেছিল বিভিন্ন বাংলা নাটক যেমন- 'নবান্ন', 'তেরশো পঞ্চাশ', 'জবানবন্দী', 'দীপশিখা' তে বাসস্থানের সংকট নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ভারত স্বাধীন হল দেশভাগের মধ্য দিয়ে। ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতানৈক্য এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা দেশ বিভাজনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। যার ফল ভোগ করতে হয়েছিল কয়েক লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে। জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের উল্লেখ করে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তানের দাবি জানান। পাকিস্তানের দাবিতে জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে। ১৯৪৬

খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চারদিন ধরে চলে দাঙ্গা। কলকাতার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জ্বলতে থাকে দাঙ্গার আগুন। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায়, ইংরেজ সরকার যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যেতে চায়। তাই কোনও রকম সমীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র হিন্দু মুসলিমের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ভারতের মানচিত্রে ছুরি চালান। রাতারাতি নিজের জন্মভূমি বিদেশে বিভূঁইয়ে পরিণত হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি ত্যাগ করে পাড়ি দেয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। যেখানে এসে তারা পৌঁছাল সেখানে এসে শুরু হল আর এক জীবন যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ঠাঁই হল স্টেশনের প্লাটফর্ম, রিলিফ ক্যাম্প, এবং উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখানকার নারকীয় জীবনে লোপ পেল মানুষের মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ। পারিবারিক জীবনের সব শালীনতা ধুয়ে মুছে গেল। এই অধ্যায়ে দেশভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের বাসস্থানের সংকট নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বাস্তুভিটা', 'নতুন ইহুদী', 'দলিল', 'ভিটেমাটি', 'দিনান্তের আগুন', 'পূর্ণগ্রাস' ইত্যাদি নাটকে উদ্বাস্তুদের জীবনযন্ত্রণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলার আর্থিক অবস্থা অতীতকালে গৌরবময় ছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের সম্পদ ইংল্যান্ড অভিমুখে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যার ফলে এদেশের অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের মানুষ প্রতিনিয়ত শোষিত হয়। ফলে তারা আর্থিক দিক থেকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য সংকট দেখা দিলে আড়তদার, মজুতদাররা বাজার থেকে সব চাল গোপনে মজুত করে কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকটকে বাড়িয়ে তোলে। এই সব কালোবাজারিদের জন্য বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। 'নবান্ন', 'জননেতা', ইত্যাদি নাটকের কালীধন, হারু দত্ত, হাকিমুদ্দির মতো চোরাকারবারিদের উল্লেখ করে নাট্যকাররা কালোবাজারির যে স্বরূপ তুলে ধরেছেন এই অধ্যায়ে তারই বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : দেশভাগের কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা নিজেদের সংকীর্ণ, দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যই দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের যূপকাষ্ঠে বলি হয়

কয়েক লক্ষ মানুষ। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের মানুষরা রেলপথে, জলপথে, পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের দুই সীমান্তে দুটি রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হয় দুটি দেশের সীমান্ত। পশ্চিমে পাঞ্জাব, পূর্বে বাংলা। বিধ্বংসী হত্যালীলার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের হিন্দু, শিখ ও মুসলিমদের জনবিনিময়ের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং রক্তাক্ত ভাবে। অন্যদিকে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু, মুসলিমের বিনিময় প্রক্রিয়া পাঞ্জাবের মতো দ্রুত হয়নি, হয়েছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে এবং দফায় দফায়। পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে ঘর ছেড়েছে কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে সমীকরণ ছিল ভিন্ন। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রলয়ের মতো জনবিনিময় হয়েছিল, পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের একসাথে ভারতের উপর ছুঁড়ে ফেলার কাজটা সেভাবে সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। রাজনৈতিক নেতারা দেশভাগের আগে জনসাধারণকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করার কোনও পদক্ষেপ তারা নিলেন না, উল্টে উদ্বাস্তুদের ছুঁড়ে দেওয়া হল ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। রাজনীতির অভিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সাধারণ মানুষের জীবন। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছিল তাই আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভারতবর্ষের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজদের হাতে শোষিত হয়েছে ঠিক এর পাশাপাশি তারা দেশীয় জমিদার, জোতদার, মহাজনের হাতেও নিরন্তর শোষিত হয়েছে। দুশো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতার পরেও ভারতবর্ষ থেকে শোষণ শেষ হল না কারণ স্বাধীন ভারতে এইসব জমিদার, মহাজনরাই বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন। আগে ইংরেজ সরকার শোষণ করত, স্বাধীনতার পর দেশীয় লোকেরা শোষণ শুরু করে। যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে খুব একটা রদ বদল হল না। কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের শোষণের কথা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের কৃষক, শ্রমিকদের শোষণ এবং বঞ্চনা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে দোলায়িত করেছে বারবার। যার ফলে তাদের জীবনে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। রুজি

রোজগারের এই অনিশ্চয়তা তাদের জীবনে ছন্দপতন করেছে। এই অধ্যায়ে খেঁটে খাওয়া মানুষদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে। 'নেকড়ে', 'দেবীগর্জন', 'শিবের অসাধ্যি', 'অবরোধ', 'অঙ্গার' প্রভৃতি নাটকে শ্রেণিসংগ্রামকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সপ্তম ও শেষ অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা সূত্রে প্রাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা নাটকে বাসস্থানের সংকট ও সমাধান নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে।